রামশরণ দারোগার গল্প

(গল্পগ্রন্থ – জন্ম ও মৃত্যু)

রামশরণবাবু আমাদের সান্ধ্য-আড্ডায় নিত্যই আসেন, কিন্তু কথাবার্তা বড় একটা বলেননা।তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিসের কর্মচারী, জীবনে অনেক জিনিসই দেখেছেন,—আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি দেখেছেন। কিন্তু তিনি এসেই একটা তাকিয়া আশ্রয় করে সেই যে আড় হয়ে শুয়ে পড়েন, যতক্ষণ না আড্ডার শেষ লোকটি চলে যায়—ততক্ষণ তিনি চোখ বুজে এবং নিজে নির্বাক থেকে অন্য সকলের কথা মন দিয়েশোনেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই মেয়েদের প্রেম ও তার মূল্য—এই ধরনের একটা আলোচনাচলছিল। এ সম্বন্ধে যার যা অভিজ্ঞতা সকলেই কোন-না-কোন ঘটনা বলছে।রামশরণবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে চোখ বুজেই বলে উঠলেন, আমার চাকুরিজীবনে একটা ব্যাপার একবার ঘটেছিল, অনেকদিন হলেও এখনও ভুলিনি। আরও ভুলিনি এইজন্যে যে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা সমস্যার মতো চিরকাল রয়ে গিয়েছে, যদিওকত জটিল সমস্যারই মীমাংসা করে বেড়িয়েছি সারা জীবন! বলি শুনুন ঘটনাটা।

আমি তখন থাকি আলমপুর থানায়। কলকাতার অত কাছে বড় শহরের উপকণ্ঠে, চুরি জুয়াচুরির আড্ডা বেশি—একথা পুলিস-কর্মচারী মাত্রই জানেন। এক মাসের মধ্যে কলকাতা পুলিস থেকে অন্তত সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—আমাদের এলাকার কোন বাগানবাড়িতে একজন নোট জাল করছে, তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি কি না। আর সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—বাগান-বাড়িতে বোমার কারখানা বসেছে, আমরা সে বিষয়ে কি খবর রাখি। ফেরারী আসামী তো হরদম পালিয়ে এসে আড্ডা দিচ্ছে আমাদের এলাকায়। একবার তো মুরশিদাবাদ জেলা থেকে— কে কার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইল থানারই পাশে আমাদের নাকের কাছে এক খোলারঘরে। তা ছাড়া বে-আইনী কোকেন্, গুম, টাকা জাল, চোরাই মালের ব্যবসা, গুণ্ডামি প্রভৃতি প্রত্যেক হাঙ্গামার সঙ্গেই কি আলমপুর থানার এলাকাভুক্ত বাগান-বাড়ি ওবস্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক? ...অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—শতকরা নব্বইটা হয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নয়ত আলমপুর থানার ত্রিসীমানায় উক্ত দুর্বৃত্তের দল কখনো পদার্পণ করেনি, তবুও কলকাতা পুলিসের এন্কোয়ারীর শ্লিপের ভিড়ে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত!

একদিন দুপুরের পর তেমন কাজকর্ম নেই, আমি রোদ পিঠে করে বসে খবরেরকাগজ পড়ছি, শীতকাল—এমন সময় গাড়ির শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখি—একখানাসেকেন্ড ক্লাস গাড়ি থেকে একজন স্ত্রীলোক থানার সামনেই নামছেন। তিনি থানারমধ্যে ঢুকে, আমাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—দারোগাবাবু কোথায়?

—বলুন—আমিই।

তখন তিনি একখানা খামের চিঠি আমার হাতে দিলেন। খাম খুলে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে বসতে বললুম।

চিঠি লিখছেন নারী-কল্যাণ আশ্রমের বিখ্যাত কর্মী শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্তী। যোগেশবাবু আমার পরিচিত পুরাতন বন্ধুও বটে, তাঁর দ্বারা স্ত্রীলোকঘটিত নানা ঘটনায় পুলিসের অনেক উপকারও হয়েছে বটে। তাঁর বর্তমান পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নেই, মাত্র এইটুকু যে, যিনি এই পত্র নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যোগেশবাবুর পরিচিত; তাঁর বক্তব্য কি, তা শুনে আমি যদি তাঁকেসাহায্য করি,—তবে ভালো হয়।

আমরা পুলিসের লোক—কাউকে বিশ্বাস করা আমাদের অভ্যাস নয়। মানুষেরচরিত্রের খারাপ দিকটা এত দেখেছি যে, এতে আমাদের দোষ দেওয়া খুব বেশি চলেনা। স্ত্রীলোকটিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখে নিয়ে মনে হল তাঁর বয়স চল্লিশেরমধ্যে হবে। এক সময়ে খুব রূপসী ছিলেন। খুব সরল চরিত্রের মেয়ে নয়—একটুখেলোয়াড় ধরনের। অবস্থাও খুব ভালো নয়।

জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি চান?

তিনি উত্তরে যা বললেন, সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে, এখানকার কোন কালী-মন্দিরের পূজারীর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় তাঁর অবস্থাখুব ভালো ছিল না বলেই ওরকম পাত্রে মেয়ে দিতে

বাধ্য হয়েছিলেন। মেয়েটি বড়ইকষ্টে আছে। তিনি বর্তমানে মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান তাঁর নিজের কাছে। যোগেশবাবুর সাহায্যে মেয়েটিকে কোথাও লেখাপড়া কি নার্সের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারেন; মোটের উপর মেয়েকে তিনি এখানে রাখতে রাজী নন, এ বিষয়ে আমায় তাঁকে সাহায্য করতে হবে।

এত সংক্ষেপে তিনি কথাটা আমায় বলেননি। স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি খুব। তাঁরনিজের জীবনের ইতিহাসও কিছু কিছু ওই সঙ্গে আমায় শুনে যেতে হল। তার মধ্যে দুটো কথা প্রধান। এক সময়ে তাঁর স্বামীর কত টাকা ছিল এবং তিনিও দেখতে এর চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন।

আমি বললুম—পুলিসের সাহায্য চান কেন? আপনি নিজেই কেন গিয়ে জামাইকেবলুন না?

তিনি বললেন—অনেকবার বলেছি, জামাই শোনে না, মেয়ে পাঠাবার মত নেই, অথচ তার দুর্দশার একশেষ করছে। আপনি নিজের চোখে গিয়ে দেখলেই সব বুঝবেন। আমি মেয়েমানুষ, আমার কোনো জোর খাটবে না তো, আমার সহায় নেই, সম্পত্তি নেই, কে আমার পক্ষ হয়ে দুটো কথা বলবে? তাই যোগেশবাবুকে ধরে আপনার কাছেআসা।

আমি বললুম—দেখুন, এতে পুলিসের কিছু করবার নেই। বিবাহিতা স্ত্রীকে রাখবারসম্পূর্ণ অধিকার আছে স্বামীর। আপনার জামাই যদি মেয়েকে না আপনার সঙ্গে দেন,আমরা তাতে কি করব?—আপনার মেয়ের মত কি?

স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্তত করে বললেন—মেয়েরও মত নয় এখানে থাকা।তারপরে কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন—আমার এই উপকারটুকুকরুন আপনি। মেয়েকে আমি নিয়ে যাবই। তার কষ্ট আর দেখতে পারিনে। আপনি একটু সহায় নাহলে—আমার আর কোনো উপায় নেই—একটু দয়া করে, আপনাকে করতেই হবে।মার খেয়ে তার শরীরে আর কিছু নেই।

স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি আমার ভালো লাগল না। অনেক রকম লোক দেখেছি মশাই, ভালো-মন্দ সব রকম দেখে যদিএকটু সিনিক হয়ে থাকি, তার জন্যে আমাদের বেশি দোষী ঠাওরাবেন না।

শেষ পর্যন্ত কতকটা উপরোধে পড়ে—কতকটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে গেলামসেই কালীবাড়ি। কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে থানায় বসিয়ে রেখে গেলাম। কালী-মন্দিরেরকাছেই ছোট্ট একতলা ঘরের একটা কুঠুরীতে পূজারী-ঠাকুর থাকে, সন্ধান নিলাম।পূজারীকে খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হল না। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, একহারাপাকশিটে চেহারা। এই বয়সেই চুলে বেশ পাক ধরেছে, দেখেই মনে হল—নেশাখোর লোক। ধড়িবাজও বটে।

তাকে সব খুলে বললাম—পুলিস দেখে সে জড়সড় হয়ে গিয়েছে। কাঁচু-মাচু ভাবে বললে—"আজ্ঞে বাড়িতে যদি আপত্তি না করে, আপনি গিয়ে শাশুড়ি ঠাকরুনকে নিয়েআসুন আমি পাঠিয়ে দেব। যদি সত্যি কথা জিজ্ঞেস করেন দারোগাবাবু, আমার মোটেইআপত্তি নেই। একটা পেট আমার, যে-কোনো রকমে চালিয়ে নেব। বেশ, আপনি চলুনআমার বাসায়। আমার স্ত্রীকে বলুন—আমি সেখানে থাকব না।"

এর পরে আমার এমন একটা অভিজ্ঞতা হল, যা অতদিনের পুলিস-জীবনে কখনোহয়নি। পূজারী যখন তার স্ত্রীকে দোর খুলতে বললে— আমরা তখন দোরের পাশে, কিন্তু অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। দোর কে একজনে এসে খুলতেই পূজারী-ঠাকুর বললে, দুটি ভদ্রলোক এসেছেন তোমার বাপের বাড়ি থেকে,—তোমার মায়ের কাছ থেকে, ওঁরা তোমাকে কি বলবেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বল। আমি একটু জলটল খাওয়ানোর ব্যবস্থা দেখি।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললে, আসুন আপনারা কথাবার্তা বলুন।...আসচি আমি।

ঘরের মধ্যে আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে আধ-ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েআছে, বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনে—কিন্তু অমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমিতো মশাই আমার জীবনে খুব বেশি যে দেখেছি, এমন মনে হয় না। টকটকে গৌরবর্ণ—মাথায় ঘন কালো চুলের রাশ, প্রতিমার মতো মুখশ্রী, কি সুন্দর হাত পায়ের

গড়ন, কি সুন্দর ছোট্ট কপালখানি। আর চোখ—সকলের চেয়ে দেখবার জিনিস তার চোখ, ডাগর ডাগর, ভাসা ভাসা, তুলি দিয়ে আঁকা টানা জোড়া ভুরু। কতদিন হয়ে গিয়েছে—এখনও সে চেহারা চোখের সামনে দেখছি।

ঘরে ঢুকে বললুম—‘মা, আমাদের দেখে ভয় পেও না, লজ্জাও কোরো না। আমরাপুলিসের লোক। এখানকার থানা থেকে আসচি। তোমার মা খানিকটা আগে থানায় আসেন এবং আমাদের অনুরোধ করেন—তাঁকে সাহায্য করতে। তিনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান। তিনি থানায় বসে আছেন। তুমি যদি যাবার মত কর, তবে তাঁকে এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে বলি। মেয়েটি একটিবার ঘাড় নেড়ে বললে— আমি যাব না।

ঘরের মধ্যে চার ধারে চেয়ে দেখি—এক কোণে একটা ভাঙা টিনের তোরঙ্গ।তোরঙ্গটার ওপরে একটা কাঠ-বাঁধানো পুরোনো আয়না ও একটা কাঁচের তেল মাখবারবাটি; এক কোণে কতকগুলো ছেঁড়া-ধুকড়ি লেপ কাঁথা। ঘরের কড়ি থেকে টাঙানোগোটা দুই দড়ির শিকে। তাতে কলাইকরা জামবাটি বসানো। পেতল কাঁসার চিহ্ন নেই কোথাও। দারিদ্র্যের এমন রূপ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হল না।

মেয়েটির উত্তর শুনে বললুম—মা, যদি তোমার স্বামীর মতামতের বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, আমি বলচি তোমার মা যদি তোমায় নিয়ে যান, তোমার স্বামীর তাতে অমত নেই। আমার কাছে তিনি বলেছেন একথা। আসবার সময় সে-সব কথা হয়ে গিয়েছে।—কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে তুমি চলে আসতে পার। আর এখানে যে কষ্টেআছো দেখচি, তাতে আমার মনে হয়—তোমার যাওয়াই ভালো।

সে এবারও ঘাড় নেড়ে বললে—না, আপনি মাকে গিয়ে বলুন—আমার যাওয়াহবে না।

সে সুরের দৃঢ়তা এমনি যে, তার ওপর আর বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবুও আরএকবার বললুম—দেখ মা, বেশ করে ভেবে দেখো, তোমার মা এসেচেন অনেক আশাকরে। আমাদের সাহায্য চেয়েচেন বলেই আমরা এসেচি। অবিশ্যি এটাও আমরাদেখবো তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে, তোমার স্বামী তোমার ওপর কোনো রূঢ় আচরণ না করেন। সে বিষয়ে তুমি নির্ভয়ে থাকতে পার।

মেয়েটি মুখ নিচু করে এবারও ঠিক আগের মতো সুরেই বললে—না আমি যাব না।

আমার কেমন একটু রাগ হল—পুলিসে কাজ করে করে একটা বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—কারো প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতাম না। একটু বিরক্তির সুরে বললুম—এই কষ্টে থাকবে, সেও ভালো? যাবে না তবুও? মেয়েটি চুপ করে রইলো। বেশ, নাযাবি মরগে যা, তাতে আমার কি? বললুম—তা হলে একটা কাজ কর—না যাও সে তোমার ইচ্ছে। আমাদের কিছু বলবার বা জোর করবার নেই। তুমি একখানা পত্র লেখ তোমার মাকে, যে আমরা তোমাকে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম, —তুমি যেতেরাজী হওনি, আমরা থানায় গিয়ে তাঁকে দেখাব।

কাগজ কলম আমরা দিলাম। মেয়েটি মেঝের ওপর বসে চিঠি লিখতে লাগল।ওর সুগৌর হাত দুটির ওপর সেই সময় ভালো করে চোখ পড়তে দেখি একজোড়ারাঙা কড় ও নোয়া ছাড়া এমন সুশ্রী সুডৌল হাতে আর কিছু নেই।

আরও কষ্ট হল ঘরের মেঝের অবস্থা দেখে। কি বিশ্রী সেঁতসেঁতে মেঝে, সপসপ করছে ভিজে। সদা-সর্বদা যেন জল উঠছে। এই মেঝের ওপর বিনা খাটে শোয় কিকরে—এ আমার বুদ্ধির অতীত। অত্যন্ত সুস্থ লোকও তিন দিন এ রকমের শুধু মেঝেরওপর যদি শুয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই একটা কঠিন অসুখে পড়বে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অবাক হয়ে চেয়ে দেখি মেয়েটি মুখ নিচু করে, পাছড়িয়ে মেয়েলি ধরনে বাঁ-হাতের কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একদিকে কাত হয়ে বসেচিঠি লিখছে আর তার ডাগর চোখ দুটি বেয়ে টসটস করে জল পড়ছে, দু’ এক ফোঁটাজল চিঠির ওপরও পড়ল।

পুলিসের চাকুরিতে মন বেশ একটু কঠিন হয়ে গিয়েছিল বটে, তবু মেয়েটিরনিঃশব্দ কান্না দেখে, ওর সংসারের এই নগ্ন দারিদ্র্য, নিরাভরণ ওই হাত দুটি, এইসেঁতসেঁতে ঘরের মেঝে, ভাঙা আয়নাখানা, ওই ধুকড়ি লেপ কাঁথা দেখে, তার ওপরওর গাঁজাখোর মূর্খ স্বামীর কথা মনে হয়ে—না মশাই, আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না—সুরটা নরম করেই বললুম—এই তো, মাকে চিঠি লিখতেই তোমার চোখদিয়ে জল পড়ছে। তবে কেন চল না তাঁর সঙ্গে?

আমার সহানুভূতির সুর বোধ হয় ওর হৃদয় স্পর্শ করলে, বললে, সেখানে এরচেয়েও কষ্ট।

ওর সেই দৃষ্টিতে হতাশা, ঔদাসীন্য, মরীয়া ভাব—সব একসঙ্গে জড়ানো।

অবাক হয়ে বললুম—এর চেয়েও কষ্ট! এর চেয়ে আর কি কষ্ট থাকতে পারে?

মেয়েটি শান্ত, স্থির সুরে বললে—আপনি সব কথা জানেন না, বললুম যে আরও অনেক কথা আছে এর মধ্যে! সে সব কথা বলতে চাইনে। মাকে আমার প্রণাম জানাবেন আর বলবেন, তোমার মেয়ে মরেচে আর তার খোঁজ কোরো না—

কথাটার শেষের দিকে রুদ্ধ-কান্নায় ওর গলার সুর আটকে গেল। আমিও চিঠিখানানিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলুম। পথে দেখি পূজারী-ঠাকুর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে আসছে, আমাদের দেখে দাঁত বার করে বললে—"হেঁ হেঁ, কি হল দারোগাবাবু? যাবলেচি, তাই হল কিনা? তা এখুনি চললেন যে...একটু যৎসামান্য মিষ্টিমুখ—"

ওর ওপর রাগ কি হিংসে কি হল জানিনে। তার সে সব আপ্যায়নের কথারূঢ়ভাবে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বললুম—ওসব থাক্। একটা কথা বলি শোনঠাকুর, কাল থানায় যেয়ো সকাল বেলা। একটা তক্তাপোশ সস্তায় নীলাম হবে। দাম তুমি যখন হয় দিও, কাল গিয়ে নিয়ে এসো সেখানা। বুঝলে?

পূজারী-ঠাকুর অবিশ্যি নিজের কাজ ভোলেনি। পরদিন সকালে এসে খাটখানা নিয়ে গিয়েছিল। এইখানেই আমার গল্পের শেষ।

আমরা এতক্ষণ একমনে শুনছিলুম। রামশরণবাবু চুপ করলে আমরা একজোটেজিজ্ঞেস করলুম—আপনি আর কখনো সে মেয়েটিকে দেখতে যাননি?

রামশরণবাবু বললেন—আর কিছুদিন আলমপুরে থাকলে হয়তো যেতুম। কিন্তু এর অল্পদিনের মধ্যে বদলির হুকুম পেয়ে আলমপুর ছাড়তে হ'ল। তারপরে সেমেয়েটির আর কোন খবর জানি না। মেয়েটি কেন মায়ের সঙ্গে যেতে চাইল না, আমিআজও বুঝতে পারিনে।